প্রবন্ধ

অবৈধ অস্ত্র কীভাবে আসে কোথায় যায়

গোলাম মোর্তোজা

ষাটের দশকের কথা। বাংলাদেশের নাম তখন 'পূর্ব পাকিস্তান'। এই অঞ্চলের রাজনীতিতে অস্ত্রের আগমন মূলত এই সময়টাতে, আইয়ুব অনুচরদের মাধ্যমে। অস্ত্র আরো নানাভাবে এসেছিল।

সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন চারু মজুমদার।

তার নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবী লড়াইয়ের সূচনা হয় দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির তরাই অঞ্চলে। খেটে খাওয়া কৃষককে চারু মজুমদার উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এই বলে, 'রামের' নামে 'মণ্ডলের' নামে, 'বিপ্লবের' নামে ভোট ভিক্ষার রাজনীতি দিয়ে কিছু হবে না।' চারু মজুমদার মনে করতেন, নির্বাচন মানেই রাজা বদল, মুখোশ বদল, শোষণমূলক সমাজ বদল নয়। এ কেবল একই মদ ভিন্ন ভিন্ন লেবেলে পুরে বিক্রি করা। তিনি মনে করতেন, গতানুগতিক ধোঁকার বিরুদ্ধে সর্বহারা মানুষকে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে সজ্জিত করার পথই সর্বহারা মানুষের মুক্তির পথ। চারু মজুমদার তার এই সমাজ বদলের ডাকে সাড়াও পেয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। সে সময়টা ছিল বিশ্বব্যাপী তারুণ্যের যুগ। সব বদলে দেয়ার জোয়ার চলছে সর্বত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজ বদলায়নি।

তবে সেই সময় যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন, তাদের একটা আদর্শ ছিল। এখন আর কোনো আদর্শ নেই। আছে অস্ত্র। এখন যাদের হাতে অস্ত্র তারা পরিচিত 'সন্ত্রাসী' নামে।

পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্র এখন সন্ত্রাসীদের হাতে।

২.

গত ৩ এপ্রিল চট্টগ্রামে ধরা পড়েছে একটি অবৈধ অস্ত্রের চালান। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবৈধ অস্ত্রের চালান। এই অস্ত্র নিয়ে শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক মিডিয়াতেও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। অবৈধ অস্ত্রের বিষয়টি আবার আলোচনা হচ্ছে নতুন করে।

তবে বাংলাদেশের অবৈধ অস্ত্রের চালান আসা এবং আটকের ঘটনা নতুন নয়। ১৯৯৬ সালের ২৪ মার্চ কক্সবাজারে একটি বড় অস্ত্রের চালান ধরা পড়েছিল। অস্ত্রের পরিমাণ ছিল দুই ট্রাক। সেই অস্ত্রের সঙ্গে ধরা পড়েছিল ১৩ জন ভারতীয় (নাগা)। নাগাল্যান্ডের বিদ্রোহীরা এই অস্ত্রগুলো জাহাজে তুলেছিল থাইল্যান্ডের একটি বন্দর থেকে। কক্সবাজার হয়ে বান্দরবানের ভেতর দিয়ে তারা অস্ত্র ভারতে নিতে চেয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সময় সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন এমন একজন বলেছেন, সেই সময় দুই ট্রাক অস্ত্র ধরা পড়েছিল সত্য। কিন্তু প্রায় সমপরিমাণ অস্ত্র ভারতে প্রবেশও করেছিল। অর্থাৎ সব অস্ত্র ধরা পড়েনি। যার প্রমাণ মেলে ২৭ মার্চ বান্দরবানে আর্মির হাতে আরো কিছু অস্ত্র ধরা পড়ে। ধারণা করা হয় এগুলো সেই চালানেরই অংশ। মজার ব্যাপার হলো এই অস্ত্র আটকের বিষয়ে আর কিছু জানা যায়নি। নাগাল্যান্ডের নাগরিকের প্রকৃত পরিচয় কী, জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি সরকার। তাদের ভাগ্যে কী ঘটলো, কিছুই জানা যায়নি। সরকারের এমন আচরণের কারণ রীতিমতো রহস্যজনক।

এবারের অস্ত্রের চালান আটকের ঘটনা নিয়ে সরকারের ভেতরে স্ববিরোধিতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

আনসার বলছে, পুলিশের উপস্থিতিতে

ট্রলার থেকে অস্ত্র নামানো হচ্ছিল। পুলিশের দাবি 'আনসার মিথ্যা বলছে। আমরাই অস্ত্র আটক করেছি।' স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, এই অস্ত্র কারা এনেছে, কেন এনেছে, এখনই মন্তব্য করা কঠিন। তবে দেশের ভেতরে নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার জন্যেও অস্ত্র আনা হতে পারে।

স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী প্রথম কথাটি খুবই চমৎকার বলেছেন। এর জন্য তিনি ধন্যবাদ পেতে পারেন। কিন্তু 'নাশকতামূলক' কর্মকান্ডের কথা বলে তিনি আবার বিরোধী দলের ওপর দায়িত্ব চাপাতে চেয়েছেন। যার সঙ্গে সত্য এবং বাস্তবতার কোনো মিল নেই। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগসহ সবগুলো বিরোধী দল এবং সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো একত্রিত হলেও এতোবড় অস্ত্রের চালান তাদের পক্ষে আনা সম্ভব নয়। সেই ক্ষমতা এবং সামর্থ্য তাদের নেই। এমনকি এর সঙ্গে বিএনপি যোগ দিলেও নয়। ফলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেয়া যাচ্ছে না।

কিছুদিন আগে ঢাকার কুড়িলে এবং বগুড়ায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র এবং গুলি ধরা পড়েছিল। সেই ঘটনাগুলোর দায়-দায়িত্বও সরকার বিরোধীদলের ওপর চাপাতে চেয়েছিল। বগুড়ার ঘটনায় বলা হয়েছিল একজন আওয়ামী লীগ নেতা জড়িত। তারপর আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। ধামাচাপা দিয়ে দেয়া হয়েছে পুরো ঘটনা। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় আওয়ামী লীগ নেতা বগুড়ায় গুলি এনেছিলেন, তাহলে ঘটনাটি তদন্ত হলো না কেন? কারণে-অকারণে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, আর এতোবড় একটি ঘটনার জন্য আওয়ামী লীগ নেতাকে ছেড়ে দেয়া হলো? বিষয়টি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে বগুড়ার গুলির ঘটনার সঙ্গে একজন জামায়াত নেতার নাম আসায় সরকার চুপচাপ হয়ে যায়। এর আগে জয়পুরহাটের অস্ত্রের সঙ্গেও জামায়াতের সম্পৃক্ততার কথা উঠেছিল। বিভিন্ন ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের কর্মী ক্যাডারদের অস্ত্রসহ গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তাদের থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিছু আধুনিক অস্ত্র। সেসব ঘটনারও তদন্ত করেনি সরকার। বাবরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় একটি প্রেসনোট পাঠিয়েছে পত্রিকা অফিসগুলোতে। প্রেসনোটে পত্রিকায় অস্ত্র উদ্ধার বিষয়ে অনুমাননির্ভর রিপোর্ট না লেখার কথা বলা হয়েছে। এতে নাকি জনমনে বিভ্রান্তি বাড়ছে। খুব ভালো কথা। বিভ্রান্তি বাড়ানো তো কারোরই কাম্য নয়।

কিন্তু যে ওসির বিরুদ্ধে অস্ত্র চোরাচালানে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ, তাকে কেন তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হলো? এটা কোন বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে? যে অভিযুক্ত সে কীভাবে তদন্ত করবে? কী তদন্ত করবে? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আর একটি সরকারি সংস্থা-আনসার। এই বিষয়টির প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কী? সম্ভবত কোনো বক্তব্য নেই। তাহলে বিভ্রান্তি তৈরি এবং জিইয়ে রাখছে কারা? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নয় কী?

বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আধুনিক অস্ত্র পৌঁছে যায় আসামের 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম (উলফা)', নাগাল্যান্ডের 'ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল' মণিপুরের 'ইউনাইটেড ন্যাশনালিস্ট লিবারেশন ফ্রন্ট' ত্রিপুরার 'অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)' 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফোর্স অব ত্রিপুরা' মিজো বিদ্রোহী প্রমুখ গ্রুপগুলোর কাছে। এই অঞ্চলে অস্ত্র যাওয়ার ট্রানজিট রুট বাংলাদেশ

অস্ত্র চোরাচালানের এই ঘটনার সঙ্গে পুলিশের সম্পৃক্ততার বিষয়টি দেশের মানুষ জেনেছে পত্রিকার মাধ্যমে। পত্রিকাগুলো মনগড়া বা অনুমাননির্ভর রিপোর্ট করেনি। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে তথ্যসহ রিপোর্ট করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ভাষায় যা অনুমাননির্ভর।

আসল ঘটনা অন্যত্র। পত্রিকার রিপোর্টের কারণে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। সত্য জেনে যাচ্ছে মানুষ। বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, পুলিশ সরকার...।

৩.

বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে দু'একটি অস্ত্রের চালান ধরা পড়ে। কয়েকদিন হইচই। তারপর চুপচাপ। কখনো সঠিক তদন্ত হয় না। ফলে জানা যায় না চীন, জার্মানি, রাশান, আমেরিকা, ইসরাইল প্রভৃতি দেশে তৈরি এই আধুনিক অস্ত্রগুলো বাংলাদেশে কীভাবে আসে?

বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে আসলে একটি ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে কৌশলগত কূটনৈতিক কারণে জড়িত হয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর একটি ফাঁস হয়ে যাওয়া ঘটনা থেকে অবৈধ অস্ত্রের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের। ভারতের নৌ, বিমান ও স্থল-সম্মিলিত সামরিক বাহিনী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছে অভিযান চালায়। অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন লিচ'। এই অপারেশনে ৬ জন অস্ত্র চোরাচালানি নিহত হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ৭৩ জনকে। ১৪০টি এ কে সিরিজের (একে-৪৭ ধরনের) রাইফেলসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি আটক করা হয়। মে মাসে তারা দুটো থাই ট্রলার থেকে ৫০ কেজি হেরোইনসহ বেশ কিছু অস্ত্র আটক করে।

জুলাইয়ের শেষদিকে ভারতের তখনকার প্রতিরক্ষা সচিব অজিত কুমার সামরিক প্রধানদের একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে একটি আদেশ দেয়া হয়। 'সামরিক গোয়েন্দা (আর্মি ইনটেলিজেন্স) বিভাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে কোনো ধরনের অপারেশন থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। অপারেশনে যাবার পূর্বে অবশ্যই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিতে হবে'।

আন্দামানের পূর্বের সমুদ্রাঞ্চল শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের (এলটিটিই) অভয়ারণ্য। তামিল টাইগাররা সোনা ও মাদক পশ্চিমে পাচার করে এবং দূরপ্রাচ্য থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনে। এই পথে অস্ত্র আনার জন্যে তারা আন্দামানের পূর্ব সমুদ্রাঞ্চল বহুদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। তামিল টাইগাররা কম্বোডিয়া থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত একটি গোপন পথ তৈরি করেছে। সেখান থেকে আন্দামান নিকোবর হয়ে শ্রীলঙ্কায় অস্ত্র নিয়ে আসে। শ্রীলঙ্কার একজন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞের মতে, এই রুটটিকে ব্যবহার করে তামিল টাইগাররা কম্বোডিয়ার কাছ থেকে রাশিয়ার স্যাম (সারফেস টু এয়ার মিসাইল) মিসাইলও কিনেছে। ভারতের সপ্তকন্যা খ্যাত রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের অস্ত্রের অধিকাংশ আসে দূরপ্রাচ্যের উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে। যেমন খেমাররুজদের কাছ থেকে তারা অস্ত্র কেনে। এই অস্ত্রগুলো কম্বোডিয়া থেকে থাইল্যান্ড হয়ে সমুদ্রপথে সেন্ট মার্টিন, টেকনাফ, কক্সবাজার বা চট্টগ্রামে পৌঁছায়।

তারপর এই অস্ত্রগুলো চলে যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন জঙ্গলে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এই তিন জেলার সঙ্গে ভারত এবং মিয়ানমারের সীমানা নিরূপণ করা যায় না।

বিডিআর নিজেই স্বীকার করে এই অঞ্চলে ৪৮০ কিলোমিটার সীমান্ত অরক্ষিত। ভারতের সপ্তকন্যার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর অবাধ যাতায়াত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। ভারতের পক্ষ থেকে সব সময় অভিযোগ করা হয় ভারতীয় বিদ্রোহীদের শেল্টার দেয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কখনোই যা স্বীকার করে না। বাংলাদেশ শেল্টার দেয় কিনা সেটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। তবে এই অঞ্চলে ভারতের এবং মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের অবস্থান অস্বীকার করার উপায় নেই। হতে পারে বাংলাদেশ তাদের শেল্টার দেয় না। আবার বাংলাদেশ তাদের প্রতিরোধ করে না বা করতে চায় না অথবা করতে পারে না।

বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আধুনিক অস্ত্র পৌঁছে যায় আসামের 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম (উলফা)', নাগাল্যান্ডের 'ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল' মণিপুরের 'ইউনাইটেড ন্যাশনালিস্ট লিবারেশন ফ্রন্ট' ত্রিপুরার 'অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ)' 'ন্যাশনাল লিবারেশন ফোর্স অব ত্রিপুরা' মিজো বিদ্রোহী প্রমুখ গ্রুপগুলোর কাছে।

এই অঞ্চলে অস্ত্র যাওয়ার ট্রানজিট রুট বাংলাদেশ।

সমুদ্রে ভারতীয় এবং শ্রীলঙ্কান বাহিনীর টহল জোরদার হলে অনেক সময় তামিল টাইগারদের কিছু অস্ত্রও চলে আসে সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, কক্সবাজার। কিছুদিন অস্ত্রগুলো এই অঞ্চলে রাখা হয়। তারপর গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেলে সমুদ্র পথেই সেগুলো চলে যায় তামিলদের হাতে। আবার অনেক সময় এই অস্ত্রগুলো তামিলরা বাংলাদেশের মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ভারতীয় বিদ্রোহীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মিয়ানমার হয়ে ভারতে প্রবেশ করে।

ভারত যখন তার বিদ্রোহীদের নিয়ে চরম বিপদের মধ্যে আছে, তখন অবৈধ অস্ত্র ধরার অপারেশন বন্ধ করার রহস্য কী?

এর পেছনে কারণ দুটো। প্রথমটি সর্বজনবিদিত। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজ মিয়ানমার সরকার বিরোধী শক্তিকে সমর্থন করেন। তার নয়াদিল্লির বাড়িতে এবিএসএল-এর (অল বার্মা স্টুডেন্টস লীগ) কার্যালয় অবস্থিত। এবিএসএল-এর সচিব এ বিষয়ে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ফার্নান্দেজ আমাদের কাছে পিতৃতুল্য মানুষ। ভারতে আসার পর থেকেই তিনি আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন। যেমন বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিল, ক্যারেনদের থাইল্যান্ড।

দ্বিতীয় কারণটি হলো 'অপারেশন লিচ'-এ আটকৃত গোলাবারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র আসলে 'র'-ই মিয়ানমারে পাঠাচ্ছিল। ভারতের ইনটেলিজেন্স এজেন্সি 'র' (RAW, Research and analytical wing) ভারতের সুবিধার্থে সবসময়েই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করে রাখতে চায়। সে উদ্দেশ্যেই তারা দূরপ্রাচ্য থেকে মিয়ানমারের গণতন্ত্র সমর্থক শক্তির জন্যে অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু মূল সামরিক বাহিনী সে কথা জানতো না। পরে তদন্তে আসল তথ্য বেরিয়ে পড়লে সরকারই বিব্রত অবস্থায় পড়ে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফার্নান্দেজের রাজনৈতিক আদর্শ এবং র-এর অত্যধিক উৎসাহের কারণে সামরিক বাহিনী উগ্রপন্থীদের অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই নিতে পারছে না। দিল্লিতে একজন মিয়ানমার কূটনীতিক বলেন, একদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে চায়। আরেকদিকে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমাদের সরকার বিরোধী শক্তিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেন।

কী অস্ত্র দাম কত...

১০ ট্রাক অস্ত্রের মূল্য কত? সবারই জানার আগ্রহ রয়েছে বিষয়টি।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো হিসাব থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। আটক ১০টি ট্রাকের অস্ত্রের মধ্যে আছে ১ হাজার ৭৯০টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৫২০টি বিভিন্ন ধরনের গুলি। কয়েক রকমের ম্যাগাজিন ৬ হাজার ৩৯২টি। গ্রেনেড ২৭ হাজার ২০টি এবং ১৫০টি রকেট লঞ্চার।

এর মধ্যে ৬৯০টি 7.62 এমএম, T56-1এসএমজি। এগুলো সাধারণভাবে দেখতে একে-৪৭ রাইফেলের মতো। ৬০০টি 7.62 এমএম, T56-2 এসএমজি। এগুলোও একে-৪৭ রাইফেল সদৃশ। এই অস্ত্রগুলো বাংলাদেশে একে-৪৭ রাইফেল নামেই পরিচিত। এ ধরনের একটি অস্ত্রের দাম ২ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গড়ে এক একটির দাম ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ধরলে ৬৯০+৬০০ মোট ১২৯০টি অস্ত্রের দাম ৩৫ কোটি ৪৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৪০০টি নাইন এমএম সেমি অটোমেটিক স্পোর্টিং রাইফেল। এগুলো দেখতে অনেকটা উজি সাব মেশিনগানের মতো। 'উজি' সাধারণত ইসরায়েলের আর্মি ব্যবহার করে। পত্রপত্রিকায় এই অস্ত্রগুলোকে 'উজি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'উজি' সাব মেশিনগান শুধু ইসরায়েলেই তৈরি হয়। দাম অনেক বেশি। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, এগুলো আসল 'উজি' নয়। ইসরায়েলের নয়, এগুলো চীনের তৈরি। নাইন এমএম সেমি অটোমেটিক স্পোর্টিং রাইফেলের দাম ২ লাখ থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গড়ে প্রতিটির মূল্য ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ধরলে ৪০০টির দাম ৯ কোটি টাকা।

প্রতিটি টমিগানের দাম ২ লাখ টাকা হিসেবে ১০০টির দাম ২ কোটি টাকা। ৪০ এমএম রকেট লঞ্চার ১৫০টি, T-69 রকেট লঞ্চার ৮৪০টি। দুই রকমের রকেট লঞ্চারের দাম প্রায় একই রকম। প্রতিটির দাম ১ লাখ ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। গড়ে প্রতিটির দাম ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ধরলে ৮৯০টির দাম ১৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। ৬ হাজার ৩৯২টি বিভিন্ন অস্ত্রের ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনগুলোর দাম ৭৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। গড়ে প্রতিটির দাম ৫০ হাজার টাকা ধরলে ৬ হাজার ৩৯২টির দাম ৩১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা।

7.62 এমএম-এর প্রতিটি গুলির দাম ১২৫ থেকে ১৭৫ টাকা। গড়ে প্রতিটির দাম ১৫০ টাকা ধরলে ৭ লাখ ৩৯ হাজার ৬০০ টির দাম হয় ১১ কোটি ৯ লাখ ৫২ হাজার টাকা। টমিগানের প্রতিটি গুলির মূল্য ৭৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকা। গড়ে প্রতিটির মূল্য ৮০ টাকা ধরলে ৪ লাখের দাম ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। প্রতিটি হ্যান্ড গ্রেনেডের দাম ৫ হাজার থেকে ৯ হাজার টাকা। গড়ে প্রতিটির দাম ৭ হাজার টাকা ধরলে ২৫ হাজার ২০টির দাম ১৭ কোটি ৫১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

মোট মূল্য দাঁড়ায় ১২৩ কোটি ৫৯ লাখ ৪২ হাজার টাকা।

এছাড়া ১০টি ট্রাক থেকে পাওয়া গেছে একটি জাপানে তৈরি ওয়াকিটকি, ৮৭ বস্তা লবণ, ২০ বস্তা খাওয়ার অনুপযোগী চাল এবং ৩০ বস্তা ধানের তুষ।

এখানে অস্ত্রের আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হলো। এক সময় যারা আন্তর্জাতিক বাজারে অস্ত্র ক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই মূল্য সাধারণত স্থির থাকে না। সব সময় ওঠানামা করে।

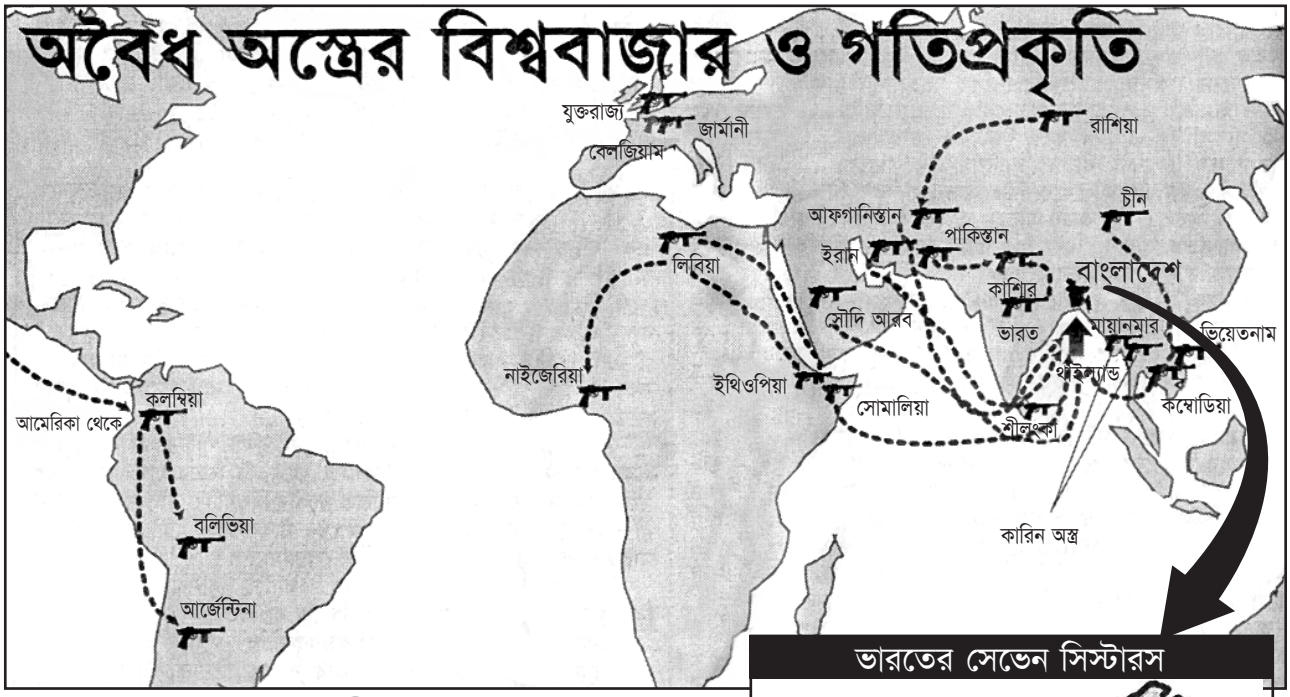

বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে আসলে একটি ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে কৌশলগত কূটনৈতিক কারণে জড়িত হয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর একটি ফাঁস হয়ে যাওয়া ঘটনা থেকে অবৈধ অস্ত্রের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়

আমরা এটা কীভাবে মেনে নিতে পারি?

দূরপ্রাচ্য থেকে ভারতে অস্ত্রপাচার রোধ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো অস্ত্রবাহী জাহাজগুলোকে ধরা। অপারেশন লিচের সাফল্যই তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তার চার মাসের মধ্যে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার অস্ত্র চোরাচালানীদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আদেশ দেন। একজন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তার মতে, 'আমাদের আগে থেকেই অনুমতি নিতে আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ধরনের নিশ্চিত তথ্য পাবার পরও অপারেশনের অনুমোদনের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব করতে হবে। সেটা অনুমোদিত হয়ে আসতে আসতে মাসখানেক লেগে যাবে। ততোদিনে ঐ অস্ত্রগুলো উগ্রপন্থীদের হাতেই পৌঁছে যাবে।'

৪.

ভারতের স্বপ্তকন্যার বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর অস্ত্র বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু অস্ত্র থেকে যায় বাংলাদেশে। বাংলাদেশের কিছু সন্ত্রাসীর হাতে যে আধুনিক অস্ত্র দেখা যায়, সেটা এভাবেই প্রাপ্ত। বান্দরবান-মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে অবৈধ অস্ত্র কেনা বেচা হয়। মিয়ানমারের বিদ্রোহীরা বাংলাদেশের সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছে অস্ত্র বিক্রি করে, প্রশিক্ষণ দেয়। এই অস্ত্রই রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে জামায়াত-শিবিরের হাতে চলে আসে। আর কিছু চট্টগ্রাম হয়ে সমুদ্র পথে সুন্দরবনের মংলা হয়ে চলে যায় খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়ার চরমপন্থী দলগুলোর হাতে।

চীন-মিয়ানমার হয়ে প্রচুর চাইনিজ অস্ত্র আসে টেকনাফে। ক্যারেন বিদ্রোহীদের মাধ্যমে এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রোহিঙ্গারা। এই অস্ত্রেরও একটি অংশ সমুদ্র পথে খুলনা-যশোর অঞ্চলের চরমপন্থী দলগুলোর হাতে এসে পৌঁছায়। অর্থাৎ বে অব বেঙ্গল এখন তামিল, মিয়ানমার, আসাম, নাগা ও বাংলাদেশীদের অস্ত্র কেনাবেচার নিরাপদ হাট।

পাকিস্তান, আফগান যুদ্ধের সময় বিশেষ করে ৮০-র দশক থেকে অস্ত্র ও ড্রাগ বাজারে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) ভারতের বিভিন্ন উগ্র স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোকে নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের শিখ এবং কাশ্মীরের মুজাহিদদের সঙ্গে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রয়েছে রমরমা অস্ত্রের ব্যবসা। সরকারি ভাবে শুধু নয়, পশ্চিম ভারতে অস্ত্রধারীদের অস্ত্রের যোগানও আসে পাকিস্তান থেকে।

আফগানিস্তান সোভিয়েট দখলে থাকাকালীন আমেরিকা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতো বিদ্রোহী আফগানদের।

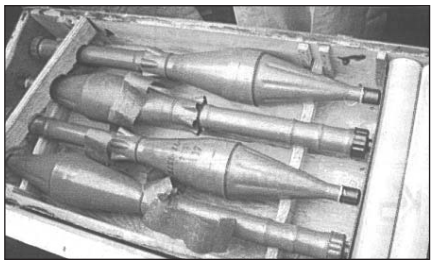

চীন-মিয়ানমার হয়ে প্রচুর চাইনিজ অস্ত্র আসে টেকনাফে। ক্যারেন বিদ্রোহীদের মাধ্যমে এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রোহিঙ্গারা। এই অস্ত্রেরও একটি অংশ সমুদ্র পথে খুলনা-যশোর অঞ্চলের চরমপন্থী দলগুলোর হাতে এসে পৌঁছায়

আমেরিকা এই অস্ত্র আফগানদের দিত পাকিস্তানের মাধ্যমে। পাকিস্তান সেই অস্ত্রের একটি অংশ সাপ্লাই দিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র চরমপন্থী দলগুলোকে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এই অস্ত্রের একটি অংশ আবার তুলে দিত বাংলাদেশের জামায়াত-শিবিরের হাতে। জামায়াতদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে এই অস্ত্র কিনে নেয় বিভিন্ন চরমপন্থী সশস্ত্র দলগুলো। উগ্র মৌলবাদী অনেক সংগঠনের জন্ম মূলত অস্ত্র ব্যবসার মাধ্যমে। জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শক্তিশালী হয়েছে। ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তান সীমান্ত এবং আফগানিস্তানে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ মাদক- আফিম। এই আফিম বিক্রি করে আফগানরা আয় করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। এই কারণে সারা বিশ্বের বড় বড় অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য আফগানিস্তান ভায়া পাকিস্তান। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রামের শিবির ক্যাডারদের কাছ থেকে আটককৃত রকেট লঞ্চার, একে-৪৭ রাইফেল তালেবানদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে এসেছে।

৫.

কম্বোডিয়া থেকে কলম্বিয়া, আমেরিকা থেকে আফগানিস্তান সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নেটওয়ার্ক। উন্নত, অনুন্নত নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই আজ অস্ত্র চোরাচালানীদের দাপটে সন্ত্রস্ত। বিভিন্ন দেশের সীমান্ত দিয়ে যে সব অস্ত্র চোরাচালানের মাধ্যমে প্রবেশ করে সেগুলোর অধিকাংশই পিস্তল, রাইফেল বা হ্যান্ড গ্রেনেডের মতো হালকা আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক। তবে ইদানীং ভারী অস্ত্র আসা শুরু হয়েছে। কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনাসহ ল্যাটিন আমেরিকান এই অঞ্চল মাদক আর অস্ত্র ব্যবসার স্বর্গরাজ্য। আফগানিস্তান, কলম্বিয়া, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে রয়েছে অবৈধ অস্ত্রের খোলা বাজার। এসব বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হয় একে-৪৭ কালাশনিকভ, ডাবল ব্যারেল শটগানের মতো হালকা অস্ত্র থেকে শুরু করে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান ও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইলের মতো ভারী অস্ত্রশস্ত্র।

থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়ার সীমান্তে পচেনটং নামক একটি জায়গা হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় অস্ত্র বাজার। থাই ও কম্বোডিয়া সরকারের যৌথ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকাটিতে নির্বিঘ্নে চলে অবৈধ অস্ত্রের কেনাবেচা। অটোমেটিক পিস্তল, একে-৪৭ রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেডসহ বিভিন্ন হালকা আগ্নেয়াস্ত্র এখানে প্রায় প্রকাশ্যে বিক্রি হয় বলে জানা যায়। বিক্রেতাদের অধিকাংশই ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েরা। এরা সেলস গার্ল মাত্র। এখানে শুধু হালকা অস্ত্রই পাবেন তা কিন্তু নয়। সারফেস টু এয়ার মিসাইল বা রকেট এয়ার মিসাইল বা রকেট প্রপেলড গ্রেনেডের মতো ভারী অস্ত্রশস্ত্রও এখানে বিক্রি হয়। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা গোপনে। ভারী অস্ত্রগুলো রাখা হয় মূলত পার্শ্ববর্তী কতগুলো কুঁড়েঘরে। শ্রীলঙ্কা সরকারের দাবি, তামিল টাইগারদের একজন প্রতিনিধি যাকে K.P নামে ডাকা হয়, তিনি ১৯৯৫ সালে এখানে আসেন এবং কিছু অস্ত্র পছন্দ করে যান। অস্ত্রগুলো পরবর্তীতে নৌপথে সীমান্তবর্তী শহর কোহ কোহ কং-এ আনা হয়। এ শহরটি মাদক ব্যবসায়ী ও যুদ্ধবাজ মাফিয়াদের নিরাপদ রাজ্য। এ শহর থেকে অস্ত্রগুলো পরবর্তীতে থাই উপসাগরের মধ্যদিয়ে শ্রীলঙ্কার জাফনা উপদ্বীপে তামিল টাইগারদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীলঙ্কা সরকারের দাবি থাইল্যান্ডের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে।

৬.

১৯৯৫ সালে ভারতে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালানে বাংলাদেশের আলোচিত হতে থাকে। '৯৫ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় একটি বিমান থেকে অস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজন ব্রিটিশ নাগরিক পিটার ব্লিচ ও কয়েকজন লাটভিয়ার নাগরিকসহ ভারতের হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন আনন্দমার্গের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আবিষ্কৃত হয় যে অস্ত্রের বাক্সের গায়ে বাংলাদেশের রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টের নাম লেখা রয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা ধারণা করেন অস্ত্রগুলো ভুলক্রমে পুরুলিয়ায় ফেলা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার সম্পৃক্ত থাকার বিষয় জানার পর বেশ বিব্রত অবস্থায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। ভারতের উত্তর-পূর্বে কার্যরত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোকে সহায়তার উদ্দেশ্যে অস্ত্রগুলো বাংলাদেশ বহন করা হচ্ছিল। এ উপমহাদেশে অস্ত্রের মূল সরবরাহকারী হচ্ছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট বাহিনী উৎখাতের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদ বাহিনীকে ব্যাপক সাহায্য-সহযোগিতা করতো। তখন পাকিস্তানে ক্ষমতায় ছিলেন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক। এ সময় জিয়াউল হকের মাধ্যমে সিআইএ আফগান মুজাহিদদের সরবরাহ করতো সর্বাধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র। যার একটি অংশ আবার চলে যেতো পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে। এই কাজটি করে জিয়াউল হক ড্রাগ ব্যবসায় মাকিনীদের প্রটেকশন পেয়েছিলেন।

এসব অস্ত্রশস্ত্রই স্নায়ুযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয় আফগানিস্তানের ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে। তালেবানদের অস্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এক সময় মার্কিনীরাই করেছিল।

দক্ষিণ আমেরিকায় অস্ত্রের প্রধান উৎস মূলত কলম্বিয়া। কোকেন, ড্রাগস ও মাফিয়াচক্রের বদৌলত কলম্বিয়ায় বহুদিন আগে থেকেই অস্ত্রের একটা স্থিতিশীল বাজার রয়েছে। কলম্বিয়ান পুলিশ প্রতি বছর প্রায় ২২ হাজার অস্ত্র এবং প্রায় ৬৪,১৮৩ রাউন্ড গোলাবারুদ আটক করে। সিনথেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি AUG gun থেকে শুরু করে বিশ্বের আধুনিকতম অস্ত্র কলম্বিয়ায় পাওয়া যায়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়ায় মাফিয়াচক্রের উত্থান ঘটে। বর্তমানে মস্কোতে মাফিয়ারা রীতিমতো প্রতাপশালী। এ মাফিয়াচক্রের অস্ত্রের চালান আসে মূলত আফগানিস্তান থেকে। মস্কোতে রয়েছে প্রায় এক লক্ষ আফগান।

ব্রিটেন অস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের নাটের গুরু হচ্ছে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি বা IRA। এ সংগঠনের মূল অর্থ সাহায্য আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসরত আইরিশদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা থেকে। প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে IRA অস্ত্র কিনে থাকে। অস্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের দিক দিয়ে খুব দ্রুত বিশ্বমান অর্জন করেছে রাশিয়াসহ সাবেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলো। কমিউনিস্ট আমলে যেখানে মস্কো শহরে একটি গুলির আওয়াজ শোনা গেলে সারা দেশে আলোড়ন উঠতো, সেখানে আজ মস্কো শহরে রাজত্ব করছে কয়েকশ' সন্ত্রাসী সংগঠন।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৫টি রাষ্ট্র প্রায় ৩০ লাখ লোক জড়িয়ে আছে এ সন্ত্রাসী মাফিয়াচক্রের সঙ্গে, যাদের মূল ব্যবসা হচ্ছে অস্ত্র এবং ড্রাগস চোরাচালান।

শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে অস্ত্র ব্যবসা ও সন্ত্রাসী মাফিয়া বাহিনীর একটি বড় আশ্রয়স্থল। দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ, শ্রমিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের যোগসাজশে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি পরিবার সন্ত্রাসী মাফিয়াচক্র পরিচালনা করে থাকে। এ সকল পরিবার প্রায়ই নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ফলে গুলির আওয়াজে কম্পিত হয় নিউইয়র্ক বা শিকাগোর মতো বসতিপূর্ণ শহরগুলো। যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রয়েছে অস্ত্র বহন করার বৈধ অনুমতি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সহজেই দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপগুলোতে অস্ত্র চলে আসে।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন ও জাপানকে আপাতদৃষ্টিতে অপরাধমুক্ত মনে করলেও এসব দেশগুলোতে কার্যরত রয়েছে বেশকিছু সন্ত্রাসী সংগঠন। চীনে রয়েছে দি রোড গ্যাং নামক বহুদিনের পুরনো একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। যাদের মূল কাজ হচ্ছে অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান। এ সংগঠনটি ব্রিটিশদের অধীনে থাকার সময় থেকেই হংকং-এ কাজ আসছে।

জাপানে সন্ত্রাসী সংগঠনের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি।

আর সারা দেশে এদের রয়েছে প্রায় এক লাখ সদস্য। এদের মধ্যে প্রধান তিনটি সংগঠন হলো ইয়ামাগুশি-গুমি, ইনাগাওয়া-কাই এবং শিমোয়ুসি কাই। টোকিওর ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকায় এসব সংগঠনের অফিস রয়েছে। এসব অফিস থেকে যে কেউ তার প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের জন্য অস্ত্রধারী ভাড়া করতে পারে। এসব সংগঠন জাপানের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে থাকে।

অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানসহ বিভিন্ন অপকর্মে ইটালিয়ান মাফিয়াচক্র বিশ্বে প্রথমসারির হলেও ইটালিতেই মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন বেশ জোরেসোরে চলছে। ইটালিতে ১৯৯০ সালে একজন জজ ও একজন ব্যবসায়ী, ১৯৯১ সালে একজন প্রাক্তন মেয়র, আর ১৯৯২ সালে আবার দু'জন জজ মাফিয়াদের হাতে নিহত হয়।

৭.

সারা বিশ্বের অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে শ্রীলঙ্কা এবং ভারত। শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগার এবং ভারতের বিদ্রোহী গ্রুপগুলো প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র কেনে। এই অস্ত্র কেনার লেনদেন হয় বিদেশের মাটিতে বসে। ডলার এবং স্বর্ণে পরিশোধ করা হয় মূল্য। কোনো রকম লিখিত চুক্তি ছাড়া লাখ লাখ ডলারের লেনদেন হয়। লেনদেনের শর্ত থাকে মূল অস্ত্র ব্যবসায়ীরা জাহাজে করে গভীর সমুদ্রের কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত অস্ত্র নিয়ে আসবে। সেখান থেকে বিদ্রোহী গ্রুপগুলো ট্রলারে করে অস্ত্র নিয়ে যাবে তাদের গন্তব্যে। গভীর সমুদ্রের নির্দিষ্ট স্থানে আনা এবং ট্রলারে তুলে দেয়া পর্যন্ত দায়-দায়িত্ব মূল অস্ত্র ব্যবসায়ীদের। এই সময়ের মধ্যে ধরা পড়লে ক্রেতাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিছুদিনের মধ্যে সমপরিমাণ অস্ত্রের আর একটি চালান পৌঁছে যাবে ক্রেতাদের কাছে। ট্রলারে তোলার পরের দায়-দায়িত্ব ক্রেতাদের। মূল অস্ত্র ব্যবসায়ী মাফিয়ারা এতোটাই শক্তিশালী যে সাধারণ অস্ত্র বোঝাই জাহাজ কখনো ধরা পারে না। সব দিক ম্যানেজ করেই তারা ব্যবসা করে। সাধারণত ধরা পড়ে ট্রলার বা ট্রাক ভর্তি অস্ত্র। এই ব্যবসায়ীরাও সব দিক ম্যানেজ করেই অস্ত্র আনে। তারপরও সব সময় সবকিছু ঠিক থাকে না। এবার যেমন ঠিক ছিল না। ধারণা করা হচ্ছে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে পুলিশ-আনসার দ্বন্দ্বেই ধরা পড়েছে ১০ ট্রাক অস্ত্র।

পাকিস্তান এবং ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা এই অস্ত্র চোরাচালান নেটওয়ার্কের সঙ্গে নানাভাবে সম্পৃক্ত। এরকম খবর মাঝেমধ্যে প্রকাশিতও হয়। কিন্তু অস্ত্র চোরাচালানের প্রধান ট্রানজিট রুট বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার এখানে অবস্থান কী?

পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্মিসহ সব গোয়েন্দা সংস্থাই তৎপর। আর্মি-বিডিআর-পুলিশের প্রবল উপস্থিতি সেখানে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মূলত আর্মি। হয়তো বলা যায়, অরক্ষিত এবং গহীন জঙ্গলে আচ্ছাদিত সীমান্তে আর্মির কিছু করার নেই। কিন্তু এই গহীন জঙ্গলে অস্ত্র যাওয়ার পথে নিশ্চয়ই আর্মির কিছু করার আছে। আর্মি আসলে কী করে?

কিছুদিন আগে বান্দরবানে একজন বাঙালি অপহৃত হয়েছিলেন। তাকে অপহরণ করেছিল মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের একটি গ্রুপ। যাদের অবস্থান বান্দরবানে, বাংলাদেশ সীমানায়। মিয়ানমারে নয়। ২১ দিন পর ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তিনি মুক্ত হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে বিদেশী বিদ্রোহীদের অবস্থানের এটা একটা প্রমাণ।

৮.

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যতগুলো অবৈধ অস্ত্রের চালান ধরা পড়েছে, তার কোনো একটি ঘটনারও তদন্ত করা হয়নি। হয়তো ক্ষমতাসীনদের অনেক অজানা বিষয় জানা হয়ে যাবে, এই আশঙ্কাতেই তদন্ত হয় না। সঠিক তদন্ত হলে জানা যেত অস্ত্র চোরাচালান এবং বিদেশী বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোনো বাহিনীর সম্পৃক্ত কতটা? কারা এর থেকে লাভবান হয়, জানা যেত সেটাও।

সন্দেহ নেই ১০ ট্রাক অস্ত্র ভারতে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এটা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কেন যেন সরকার এই বিষয়টি প্রকাশ করতে চায় না। ভয়টা কিসের? সঠিক তদন্তের মাধ্যমে এটা প্রকাশ করেও তো বলা যায়, আমরা কোনো সন্ত্রাসীদের শেল্টার দেই না, অস্ত্রের ট্রানজিট রুট বাংলাদেশ নয়। সন্ত্রাসীদের ধরার জন্যে আমরা তৎপর।

এবারের অস্ত্র চোরাচালানের ঘটনা প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক তদন্ত হবে। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটা এক ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য। বাস্তবে এর কিছুই হবে না। অন্য আর ১০টি ঘটনার মতো এই ঘটনাটিও চাপা পড়ে যাবে। বাইরের বিশ্ব বাংলাদেশ এখন ভুগছে ভাবমূর্তি সংকটে। মৌলবাদের উত্থান যার অন্যতম কারণ। পাশাপাশি অস্ত্র চোরাচালানের বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য তৈরি করছে নতুন সংকট। এর থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় অস্ত্র চোরাচালানের সঠিক তদন্ত, দোষীদের শনাক্ত এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। এটা আমরা শুধু লিখতে পারি। যাদের করার কথা তারা করবেন না। কারণ তাদেরই কেউ কেউ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যতগুলো অবৈধ অস্ত্রের চালান ধরা পড়েছে, তার কোনো একটি ঘটনারও তদন্ত করা হয়নি। হয়তো ক্ষমতাসীনদের অনেক অজানা বিষয় জানা হয়ে যাবে, এই আশঙ্কাতেই তদন্ত হয় না। সঠিক তদন্ত হলে জানা যেত অস্ত্র চোরাচালান এবং বিদেশী বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোনো বাহিনীর সম্পৃক্ত কতটা? কারা এর থেকে লাভবান হয়, জানা যেত সেটাও